'Postulate' কথাটির অর্থ পূর্বস্বীকৃতি। বিভিন্ন শাস্ত্র তাদের বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য কতকগুলি ধারণাকে স্বীকার করে নেয়। বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং কলাবিদ্যা এই রকম নানা ধারণাকে স্বীকার করে। শাস্ত্র আলোচনার পূর্বেই এই নিয়মগুলি স্বীকার্য বলে তাদের পূর্বস্বীকৃতি বলা হয়। নীতিবিদ্যাও নৈতিকতা বা নৈতিক বিচার সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই রকম কতকগুলি বিষয়কে পূর্বস্বীকৃতি রূপে গ্রহণ করে। তাদের স্বীকার না করলে নৈতিকতার বিচার মিথ্যা হয়ে যায়।

একটি শাস্ত্রে যা পূর্বস্বীকৃত সেই শাস্ত্রে তা প্রমাণিত হয় না। আলোচনার অন্য কোন স্তরে তাদের প্রমাণ করা যেতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ তারা একটি শাস্ত্রে পূর্বস্বীকৃত ততক্ষণ তারা সেই শাস্ত্রে স্বতঃসিদ্ধ রূপেই গৃহীত হয়। সুতরাং পূর্বস্বীকৃতি মাত্রই স্বতঃসিদ্ধ এ কথা বলা চলে।

কান্ট তাঁর নীতিদর্শনে নৈতিক বিচারের কয়েকটি পূর্বস্বীকৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে কর্মের নৈতিক বিচার কয়েকটি ধারণার প্রতি ইঙ্গিত করে যাদের আমরা স্বীকার করতে বাধ্য; অন্যথা কর্মের নৈতিক বিচার হয় না। কান্ট নৈতিক বিচারের জন্য আবশ্যক তিনটি পূর্বস্বীকৃতির উল্লেখ করেছেন—স্বাধীনতা, ঈশ্বর ও অমরত্ব। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই বিষয়গুলিকে স্বীকার করার জন্য তাদের প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। যেমন ঈশ্বরকে স্বীকার করার জন্য তাঁকে দেখা বা জানার প্রয়োজন নেই। যে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে ঈশ্বরকে স্বীকার না করতে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এই সমস্যা দূর করে নৈতিক বিচারকে সম্ভব করার জন্য নীতিবিদ্যায় ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়। তাঁর অস্তিত্বকে অন্যভাবে সিদ্ধ করার জন্য নীতিবিদ্যার কোন প্রয়োজন নেই। নীতিদার্শনিক ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সিদ্ধ করার জন্য কোন যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থিত করেন না, কারণ তার প্রয়োজন নেই। নীতিদার্শনিক শুধু এ কথাই বলতে চায় যে ঈশ্বরকে স্বীকার না করলে নৈতিক বিচার করা যায় না।

ইচ্ছার স্বাধীনতা

কান্ট যে তিনটি পূর্বস্বীকৃতির কথা বলেছেন তার মধ্যে স্বাধীনতা অন্যতম। নৈতিক বিচারের পটভূমিতে এই স্বাধীনতাকে freedom of the will অর্থাৎ ইচ্ছা বা সংকল্পের স্বাধীনতা বলা হয়। যে আচরণের জন্য আমরা দায়ী সেই আচরণেরই নৈতিক মূল্যায়ন সম্ভব। একজন মানুষকে সেই আচরণের জন্য দায়ী করা যেতে পারে যা তার ইচ্ছাকৃত। পারিপার্শ্বিকের চাপে আমরা যে কাজ করি তার জন্য

Scanned with OKEN Scanner

আমাদের দায়ী করা যায় না। এবং সেই আচরণকে ভালো বা মন্দ বলাও অসঙ্গত। আমাদের কর্মকে স্বাধীন বলার অর্থ এই নয় যে সেই কর্ম কারণবিহীন। বিশ্বের যে কোন ঘটনার মত কর্ম মাত্রই কারণ প্রসূত হবে। তবে নৈতিক বিচারের জন্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে সেই কারণ আমার বহিঃস্থিত নয়। আমি নিজেই আমার কর্মের কারণ। দার্শনিক পরিভাষায় একেই 'autonomy' বলা হয়।

ইচ্ছার স্বাধীনতাকে নীতিবিদ্যার পূর্বস্বীকৃতি বলা হয়েছে, কারণ স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বের প্রশ্নটি জড়িত। আসলে নৈতিক বিচারের জন্য আমরা যে আচরণকে বিবেচনা করি তার মাধ্যমে সেই আচরণের কর্তাকেও বিচার করা হয়। এই বিচার বা মূল্যায়ন তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন একজন্য ব্যক্তি সেই আচরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। একজন ব্যক্তিকে তার কর্মের জন্য তখনই দায়ী বলা চলে যখন সেই ব্যক্তির পছন্দ বা নির্বাচনের (choice) স্বাধীনতা থাকে। যে কাজ মানুষের পক্ষে স্বাধীনভাবে করা সম্ভব নয় সেই কাজের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। একথা কান্টের একটি উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে —. 'You ought implies you can' অর্থাৎ আমরা তখনই কোন কর্মকে কোন ব্যক্তির পক্ষে করা উচিত বলে মনে করতে পারি যদি সেই ব্যক্তির পক্ষে সেই কর্ম করার সমার্থ্য থাকে। এই সামর্থ্যই স্বাধীনতার লক্ষণ। ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের স্বাধীনতা আছে বলেই কর্তব্য, ঔচিত্য ইত্যাদি শব্দগুলি অর্থপূর্ণ হয়। সুতরাং কান্টের মতে ঔচিত্যবোধের প্রশ্ন যেখানে সঙ্গত সেখানে কর্ম বা সঙ্কল্পের স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে হবে।

স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও নৈতিক বিচার — এই তিনটি ধারণার মধ্যে সম্পর্ক অতি নিবিড়। একটি দৃষ্টান্ত এই সম্পর্ককে স্পষ্ট করতে পারে। যে চালকটি পথিমধ্যে একজনকে চাপা দিয়েছে সে তার এই কর্মের জন্য দায়ী, কারণ সে গাড়ি না চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত; এ বিষয়ে তার স্বাধীনতা ছিল। আবার সে হয়ত দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়েছিল যদিও ধীরে ধীরে গাড়ি চালানোর কথাও সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারত। এই স্বাধীনতা ছিল বলে পথ দুর্ঘটনার দায়িত্ব চালককে নিতে হবে। এইভাবে স্বাধীনতার ধারণার মাধ্যমে দায়িত্বের ধারণাটি একটি নৈতিক তাৎপর্য লাভ করে।

Scanned with OKEN Scanner

কাজের কর্তা বলি। একজন মানুষকে তার কাজের কর্তা বলার অর্থ শুধুমাত্র এই নয় যে সেই ব্যক্তি তার কর্মের কারণ। অনেক প্রাকৃতিক শক্তিকেও এই অর্থে কারণ বলা হয়। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একটি বস্তুর অধোগমনের কারণ। কিন্তু এই অর্থে আমরা মানুষকে তার কর্মের কারণ বলি না। একজন মানুষকে তার কর্মের কারণ তখনই বলা হয় যখন আমরা বুঝি যে সে তার কর্মটি নাও করতে পারত। সেই মানুষকেই তার কাজের কর্তা বলা হয় যখন আমরা দেখি যে সে একটি কাজ করবে কিনা তা সে স্বাধীনভাবে নির্ণয় করতে পারে। মানুষ যখন স্বাধীনভাবে তার কাজ করে তখনই সে তার কাজের জন্য দায়ী হয়। প্রাকৃতিক কারণ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাই নিছক কারণ, কিন্তু কর্তা নয়। একমাত্র মানুষই তার কৃতকর্মের কর্তা বা Agent।

মানুষ তার কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন, কারণ সে তার কর্ম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং স্বেচ্ছায় তার কর্মপালন করতে পারে। মানুষ যন্ত্র নয়। সে তার কর্মে যন্ত্রের মত পরিচালিত হয় না। এই জন্যই অ্যারিস্টটল তাঁর নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় ঐচ্ছিক ক্রিয়ার (Voluntary action) বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ঐচ্ছিক ক্রিয়া কোন বাহ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। আধুনি দার্শনিকদের মধ্যে একজন বলেছিলেন যে কর্মের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করাই নৈতিকতার আদর্শ।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কর্মের কারণ হওয়া এবং কর্মের কর্তা হওয়া এক কথা নয়। নির্বাচন করা বা সিদ্ধান্ত করার স্বাধীনতা থাকলেই মানুষকে কর্তা বলা হয়। এইরকম একজন কর্তার স্বাধীন কর্মই নৈতিক বিচারের বিষয় হয়।

দীর্ঘদিন যাবৎ ইচ্ছা বা কর্মের স্বাধীনতার ধারণাটি দার্শনিকদের বিব্রত করেছে। এই সমস্যাটিকে "The problem of free will" বা স্বাধীন ইচ্ছার সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়। দার্শনিকরা নানা কারণে সন্দেহ করেছেন যে আমরা আদৌ স্বাধীন কিনা। এই সন্দেহের পরিণাম নীতিবিদ্যার পক্ষেক্ষতিকর। কারণ কোন মানুষ যদি প্রকৃতই স্বাধীন না হয় তাহলে কোন মানুষকে তার কর্মের জন্য দায়ী করা যাবে কিনা সন্দেহ। সেক্ষেত্রে কোন মানুষকে তার কর্মের জন্য প্রশংসা বা নিন্দা করা যাবে না।

Scanned with OKEN Scanner

করি না। ঈশ্বর আমাদের অবিশুদ্ধ করে নির্মাণ করেছেন বলেই আমাদের কাজ অনৈতিক হয়। আমাদের কর্মের অনৈতিকতার জন্য ঈশ্বর দায়ী; আমরা দায়ী নই, তাই আমাদের কর্মের জন্য কোন নিন্দাই আমাদের প্রাপ্য নয়।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। বিজ্ঞানীদের মতে জগতের সমস্ত ঘটনা, এমনকি মানুষের ক্রিয়াও অন্য কোন ঘটনার দ্বারা উৎপন্ন হয়; সেই ঘটনা আবার অন্য ঘটনার দ্বারা উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। জগতে আকস্মিকতার কোন স্থান নেই। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে আমরা যতই মানুষের মনস্তত্ত্ব ও স্নায়ুতত্ত্বকে জানি ততই আমরা বুঝি যে আমাদের সমস্ত ক্রিয়াই এমন কিছু কারণের দ্বারা উৎপন্ন যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই রকম নিয়ন্ত্রণবাদ যদি সত্য হয় তাহলে মানুষের স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব আছে একথা বলা যাবে না। মানুষের আচরণ অনেকটাই যান্ত্রিক বলে মনে হবে। আমাদের কোন কাজকেই বিশুদ্ধভাবে ইচ্ছাকৃত বলা যাবে না।

এ ছাড়াও ভাববাদীদের মতে মানুষ এক পরম সত্তা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই পরমসত্তা ছাড়া ব্যক্তি মানুষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এই পরমসত্তাকেই আমাদের সমস্ত কর্মের কারণ বলতে হবে। সুতরাং একদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক জড়বাদ এবং অপরদিকে ভাববাদের মতে আচরণের নৈতিকতার ধারণাটি মিথ্যা।

কিন্তু আমরা কি সত্যই আমাদের নৈতিক জীবনকে অস্বীকার করতে পারি? আমরা যদি আমাদের নৈতিক জীবনকে স্বীকার করি তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে এবং সে নিজেই তার কর্মের কারণ। যে মতবাদ মানুষের ইচ্ছা বা কর্মের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না সেই মতবাদ গ্রাহ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে অনেক দার্শনিক উল্লিখিত নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। অনেকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বলতে চেয়েছেন যে বিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণবাদকে সমর্থন করে না। আবার অনেকের মতে জগতে স্বাধীনতা আছে একথা মিথ্যা নয়; আমাদের ইচ্ছাই তার প্রমাণ।

Scanned with OKEN Scanner

আত্মার অমরতা
Immortality of Soul

কান্টের মতে নৈতিক আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করাই মানুষের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তির তাড়নাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ যেহেতু ঈশ্বরের মত শুদ্ধ নয় তাই নৈতিক পথে অগ্রসর হওয়ার সময় প্রবৃত্তির বিপরীতমুখী আকর্ষণকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। তাই প্রবৃত্তি আর সদিচ্ছার মধ্যে বিরোধ অব্যাহত থাকে। তবু মানুষকে ঈশ্বরের মত শুদ্ধ হতে হবে যেখানে এই বিরোধকে আমরা জয় করতে পারি। কিন্তু অশুদ্ধ মানুষ কি কখনও তার ইচ্ছাকে নৈতিক বিধির অভিমুখী করে তুলতে পারে যেখানে প্রবৃত্তির সংঘাত নেই? কান্ট মনে করেন যে মানুষের পক্ষে নৈতিকতার এই আদর্শে পৌঁছান সম্ভব। তার জন্য একটি জীবনের সংগ্রাম হয়ত যথেষ্ট নয়। নিরঙ্কুশ নৈতিক শুদ্ধতা লাভ করতে হলে মানুষকে অনন্তকাল প্রচেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তার জন্য অনন্ত জীবন প্রয়োজন। কান্ট তাই মানুষের অমরতাকে স্বীকার করেছেন।

র‍্যাশডাল (Rashdall) তাঁর 'Theory of Good and Evil' নামক গ্রন্থে আরও দুটি পূর্বস্বীকৃতির উল্লেখ করেছেন।

ক) নীতিবিদ্‌রা সাধারণতঃ জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। জগতে যদি অমঙ্গলের অস্তিত্ব না থাকত তাহলে মানুষের নৈতিক হবার জন্য সংগ্রামও অর্থহীন হয়ে পড়ত। দুঃখ আছে বলেই মানুষ সুখের সন্ধান করে। অমঙ্গল আছে বলেই মঙ্গলের জন্য সে সন্ধান করে। মন্দ আছে বলেই তো ভালোর জন্য মানুষ সাধনা করে।

খ) কালপ্রবাহের বাস্তবতাও নৈতিকতার আর একটি পূর্বস্বীকৃতি। সময় যদি মিথ্যা হয় তাহলে পরিবর্তনও মিথ্যা হবে। কিন্তু তাহলে এ কথা মিথ্যা হয়ে যাবে যে মানুষের নৈতিক কর্ম একদিকে বাহ্য জগতে এবং অপরদিকে নৈতিক কর্তার চরিত্রে পরিবর্তন আনে।

Scanned with OKEN Scanner

একথা সত্য যে নৈতিকতার জন্য একটি স্থায়ী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। মানবসত্তা যদি ক্ষণিক বা নিয়তপরিবর্তনশীল হত তাহলে তার কর্মের মূল্যায়ন করে তাকে বিচার করা অর্থহীন হয়ে যেত। একটি কাজের কর্তা যদি তার কাজ করার পর বিনষ্ট হয়ে যেত তাহলে কার উপর আমরা সেই কর্মের দায়িত্ব আরোপ করতাম? যে ব্যক্তি কর্ম করে, সেই যদি তার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলেই তাকে নীতিগতভাবে ভালো বা মন্দ বলা যেতে পারে। তাই নৈতিক বিচারের জন্য একটি স্থায়ী ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব প্রয়োজন। এখানে স্থায়িত্বের অর্থ সত্তার অপরিবর্তনীয়তা নয়। ব্যক্তিসত্তা যদি অপরিবর্তনীয় হয় তাহলে নৈতিক প্রচেষ্টা কিভাবে মানুষকে নৈতিক পূর্ণতার লক্ষ্যে নিয়ে যাবে? তাই কাল বা পরিবর্তনশীলতাকে একটি পূর্বস্বীকৃতি বলা হয়েছে।

Scanned with OKEN Scanner

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে 'ভালো' এবং 'মন্দ' দুটিই নৈতিক মূল্যায়নমূলক শব্দ। তাই যখন কোন ক্রিয়াকে 'ভালো' বলা হয় তখন যেমন তার নৈতিক মূল্যায়ন করা হয়, সেইরকম যখন কোন ক্রিয়াকে 'মন্দ' বলা হয় তখনও তার নৈতিক মূল্যায়ন করা হয়। তবে যখন কোন ক্রিয়াকে 'ভালো' বলা হয় তখন আমাদের বক্তব্য এই যে সেই ক্রিয়াটি নীতিসম্মত বা moral; আবার যখন কোন ক্রিয়াকে 'মন্দ' বলা হয় তখন আমাদের বক্তব্য এই যে ক্রিয়াটি নীতিসম্মত নয়, অর্থাৎ ক্রিয়াটি immoral। কোন ক্রিয়াকে যদি moral বলা হয় তা হলে যেমন ক্রিয়াটিকে নৈতিক ক্রিয়া বলা হবে সেইরকম কোন ক্রিয়াকে 'immoral' বলা হলেও ক্রিয়াটিকে নৈতিক বলা হবে। আসলে সেই ক্রিয়াই নৈতিক যার নৈতিক মূল্যায়ন হয়। 'ভালো' বলা এবং 'মন্দ' বলা একইভাবে নৈতিকতার লক্ষণ। যাকে 'ভালো' বা 'মন্দ' কিছুই বলা যায় না তাই 'non-moral' বা 'অনৈতিক'।

অনৈতিক ক্রিয়া
Non-Moral Action

আমরা জানি যে আমাদের সমস্ত কর্মই ভালো বা মন্দ বলে বিচারের যোগ্য নয়। যে ক্রিয়াকে ভালো বা মন্দ বলে বিচার করা যায় না সেই ক্রিয়াই অনৈতিক ক্রিয়া। যাবতীয় অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকে অনৈতিক ক্রিয়া বলা হয়।

অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
Non-Voluntary Action

যে ক্রিয়া আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা প্রণোদিত নয় তাই অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। আমাদের দেহযন্ত্রের সাহায্যে এই ক্রিয়া সম্পাদিত হলেও এর পিছনে সচেতন সঙ্কল্প থাকে না। অভ্যাসবশতঃ আমরা যে কাজ করি অথবা যে কাজ স্বয়ংক্রিয় বা স্বতঃস্ফূর্ত তা আমাদের ইচ্ছার দ্বারা পরিকল্পিত বা পরিচালিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, প্রতিবর্ত ক্রিয়া একটি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। আমার হাতটি আগুনের কাছাকাছি গেলে আমি তৎক্ষণাৎ হাতটি সরিয়ে নিই। এই ক্রিয়ার পিছনে চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশ নেই। যেহেতু এই কাজ স্বাধীন বা পরিকল্পিত নয় অথচ এখানে একরকমের আবশ্যিকতা আছে তাই আমি এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করি না। এই কারণে এই জাতীয় কাজকে ভালো বা মন্দ বলা অর্থহীন। এইভাবে এই কর্ম নৈতিক বিচারের যোগ্য হয় না। এই অনৈচ্ছিক ক্রিয়া অনৈতিক কর্ম বলে গণ্য হয়।

নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলিকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলে উল্লেখ করা হয়—

(১) **স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়া (Automatic Action)** — এই ক্রিয়াগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে। শিশু জন্মবার পরই যে অঙ্গসঞ্চালন করে তা শিশুর ইচ্ছাপূর্বক

Scanned with OKEN Scanner

ক্রিয়া নয়। এই ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত। পরিণত বয়স্ক মানুষের মধ্যেও এই জাতীয় অনেক ক্রিয়া দেখা যায়, যেমন রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া, পরিপাকক্রিয়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া প্রভৃতি আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে ঘটে থাকে। আমাদের নিজের দেহযন্ত্রের ক্রিয়া হলেও আমরা এই ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকি না।

(২) **প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action)** — বাহ্য উদ্দীপকের উপস্থিতিতে ইচ্ছা প্রয়োগ ছাড়াই যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয় তার নাম প্রতিবর্ত ক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া সচেতন নয় এবং সম্পূর্ণভাবে পূর্বপরিকল্পনা রহিত। চোখে তীব্র আলো পড়লে আমরা তৎক্ষণাৎ চোখের পাতা বন্ধ করি। এর জন্য কোন পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না। এটি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। প্রতিবর্ত ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ এবং সেই কারণে তার কোন নৈতিক মূল্য নেই।

(৩) **ভাবজ ক্রিয়া (Ideo-motor Action)**— কখনও কখনও কোন ভাব আমাদের মধ্যে ক্রিয়ার সঞ্চার করে। এই ক্রিয়ার নাম ভাবজ ক্রিয়া। কোন কোন ভাব আমাদের মনে যখন অত্যন্ত প্রবল বা তীব্র হয় তখন তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশোন্মুখ হয়ে ওঠে এবং বাহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মনের ভাবকে ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য কোন সচেতন সঙ্কল্পের প্রয়োজন হয় না। ফুটবল খেলার দর্শক যখন গোলপোস্টের মুখে বল দেখে তখন তার মনে এইরকম ভাব উপস্থিত হয় যে গোল হোক্ এবং তৎক্ষণাৎ সে নিজের অজান্তেই পা ছোঁড়ে। এই ক্রিয়া সচেতনভাবে পরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত নয়। তাই এই ক্রিয়ার নৈতিক মূল্য নেই।

(৪) **সাহজিক ক্রিয়া (Instinctive Action)**— প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি থাকে। এই প্রবৃত্তি জন্মগত। মানুষের মধ্যেও এই প্রবৃত্তি আছে। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, সন্তান পালনের প্রবৃত্তি, বংশরক্ষার প্রবৃত্তি প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রবৃত্তিবশে মানুষ যে ক্রিয়া করে তাকেই সাহজিক ক্রিয়া বলে। সাহজিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল এই ক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক, অথচ সচেতনভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই ক্রিয়া করা হয় না। ইচ্ছাপূর্বক করা হয় না বলে সাহজিক ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বলা হয়।

(৫) **অনুকরণমূলক ক্রিয়া (Imitative Action)**— আমরা যে অন্যের ক্রিয়াকে অনুকরণ করি এ কথা অনস্বীকার্য। এই অনুকরণ ইচ্ছাকৃত হতে পারে আবার ইচ্ছাকৃত নাও হতে পারে। যেমন, শিশু অন্যের আচরণকে অনুকরণ করে। কিন্তু শিশুর এই অনুকরণ ইচ্ছাকৃত নয়। তার অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত। সেইজন্য শিশুর অনুকরণমূলক ক্রিয়াকে অনৈচ্ছিক বলা হয়। স্বভাবতঃই এই ক্রিয়া অনৈতিক।

Scanned with OKEN Scanner

ঐচ্ছিক ক্রিয়া
Voluntary Action

কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিকল্পিতভাবে বা সচেতনভাবে যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকেই ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে। এই ক্রিয়া উদ্দেশ্যমুখী, ইচ্ছাপূর্বক এবং সচেতন প্রযত্ন সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ে যাবার উদ্দেশ্যে একজন ছাত্র যখন প্রস্তুত হয়ে বিদ্যালয়ের পথে যাত্রা করে তখন তার ক্রিয়াকে ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলে। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর সূত্রপাত হয় একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিকল্পনার মাধ্যমে। কিন্তু শুধুই পরিকল্পনা নিরর্থক হয় যদি তা কার্যে পরিণত না হয়। তার জন্য প্রয়োজন প্রযত্ন বা প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা আমাদের দেহকে সঞ্চালিত করে এবং ঐচ্ছিক ক্রিয়ার জন্ম দেয়।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যেতে পারে—

মানসিক স্তর (mental stage), **দৈহিক স্তর** (bodily stage) এবং **বাহ্যিক স্তর** (external stage)।

মানসিক স্তর (Mental stage)— এই তিনটি স্তরের মধ্যে মানসিক স্তরটি সর্বাপেক্ষা জটিল। মানসিক স্তরে শুধুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিকল্পনা সরলভাবে থাকে না। এই পরিকল্পনা নানা পর্যায় অতিক্রম হয়ে দৈহিক স্তরে প্রবেশ করে।

(ক) **প্রথমতঃ** কোন কর্মের চিন্তাই আমাদের মনকে অধিকার করতে পারে না যদি আমার মনে কর্মের স্পৃহা না থাকে। কর্মের স্পৃহা আসে শূন্যতা বা অভাবের বোধ থেকে। একজন মানুষ খাবারের অন্বেষণ করতে প্রবৃত্ত হয় যদি তার মধ্যে ক্ষুধা থাকে। ক্ষুধা একরকম অভাববোধ। ক্ষুধার সঙ্গে যুক্ত থাকে খাদ্যের অভাববোধ। এই অভাব দূর করার জন্য আমরা কর্মে অর্থাৎ খাদ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই।

(খ) **উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের ধারণা**— শুধু অভাববোধ নয়, এই অভাব কিভাবে নিবৃত্ত হতে পারে সে বিষয়ে যদি স্পষ্ট ধারণা না থাকে তা হলে অভাবই থাকবে, তাকে নিবৃত্ত করা যাবে না। আমার ক্ষুধার কষ্ট আমাকে কোন কর্মেই প্রবৃত্ত করতে পারবে না যদি আমার এই ধারণা না থাকে যে খাদ্যই আমার এই অভাব দূর করতে পারে। লক্ষ্য বস্তুর এই বোধ নিয়েই আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই।

(গ) **কামনা**— অভাববোধ এবং সেই অভাব যে বস্তুর দ্বারা নিবৃত্ত হতে পারে সেই বস্তুর ধারণা নিষ্ফল হবে যদি সেই বস্তু সংগ্রহ করার কামনা বা ইচ্ছা আমার মধ্যে না থাকে। ইচ্ছা সর্বদা কর্মের পূর্বগামী হয়। যেখানে ইচ্ছা বা কামনা নেই সেখানে কর্মও থাকে না। সুতরাং ক্ষুধায় আমি খাদ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হব যদি খাদ্য সম্বন্ধে আমার ধারণা থাকে এবং আমার মধ্যে খাদ্য সংগ্রহের কামনা থাকে।

Scanned with OKEN Scanner

কামনা যদি একমুখী হয় তা হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সহজ হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমাদের কামনা বহুমুখী অর্থাৎ আমরা বহু বস্তু একই সঙ্গে কামনা করি। তখন যেন কামনাও বহু হয়ে যায়। প্রতিটি কামনাই যেহেতু পরিতৃপ্তি চায় তাই বহু কামনার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়।

(ঘ) মানুষের মনের স্বভাবই হল সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায়। তাই সে চায় বিভিন্ন কামনার দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি হোক। তাই কামনাসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে মানুষ গুরুত্ব, সম্ভাব্যতা প্রভৃতি বিচার করে কোন একটি কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে চায় এবং অপর কামনাগুলিকে বর্জন করে। এইভাবে লক্ষ্যবস্তু এবং তার কামনা নির্দিষ্ট হলে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে। বিভিন্ন কামনার দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে একটি বিশেষ কামনাকে নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মানসিক পর্যায় সমাপ্ত হয়।

দৈহিক স্তর (Bodily stage)— মানুষ যখন কামনার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি লাভ করে তখনই সে একটি নির্দিষ্ট কামনা পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা কিন্তু মানসিক নয়। কামনার নিবৃত্তির জন্য দৈহিক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। কি জাতীয় দৈহিক ক্রিয়া কামনা পরিতৃপ্ত করবে তা নির্ভর করে কামনার প্রকৃতির উপর। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আহার্যের কামনাই নির্ধারণ করে দেয় আমাকে কিরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। আমরা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালন করে তখনই খাদ্যভাণ্ডারে যাই। যদি রোগীকে সেবা করা বা তার যন্ত্রণা নিবৃত্ত করা আমার কামনা হয় তাহলে আমার মধ্যে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার দৈহিক প্রবৃত্তি হবে।

বাহ্য স্তর (External stage)— দৈহিক ক্রিয়ার ফলে বাহ্য জগতে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার পরিণাম।

Scanned with OKEN Scanner

পরসুখবাদ বা উপযোগবাদ
Altruism or Utilitarianism

নীতিবিদ্যায় কোন মতবাদ যদি সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করে থাকে তা হলে তার নাম উপযোগবাদ। এই মতবাদের প্রথম আভাস পাওয়া যায় ডেভিড হিউমের (১৭১১-১৭৭৬) রচনায়। কিন্তু জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) ও জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-১৮৭৩) রচনায় এই মতবাদ একটি সুনির্দিষ্ট তত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদ সুখকে মানুষের যাবতীয় কর্মের লক্ষ্য বলে উল্লেখ করে। কিন্তু এই সুখ কেবলমাত্র আত্মসুখ নয়। পরসুখবাদ মনে করে যে মানুষ কেবল আত্মমুখী নয়; অন্যের স্বার্থ বা সুখ সম্বন্ধে সে উদাসীন নয়। পরসুখবাদী এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় যেখানে সকল মানুষই সুখী। এই অভিপ্রায় নিয়েই নৈতিকতার মূল বা প্রাথমিক সূত্রটি রচিত হয়েছে। আমাদের কি করা উচিত তা স্থির করার জন্য সেই রকম কর্মপন্থাকে বেছে নেওয়া আবশ্যক যা সেই কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় এমন সমস্ত মানুষের সর্বাধিক সুখ উৎপাদন করে। এই সর্বকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নৈতিক আচরণকে চিহ্নিত করা যাবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে খুবই সাধারণ বলে মনে হতে পারে। দুঃখকে প্রতিরোধ করা এবং সুখ বৃদ্ধি করা যে কোন মানুষই তার জীবনের ব্রত বলে মনে করে। কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার করলে এই মতবাদকেই বৈপ্লবিক বলে মনে হবে যা হয়ত মার্কস এবং ডারউইনের তাত্ত্বিক বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। পরসুখবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে এই মতবাদ নৈতিকতার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিধানের কথা বলেনি, অথবা কতকগুলি বিমূর্ত অথচ অনমনীয় বিধির প্রতি আনুগত্য দেখায়নি। নৈতিকতাকে বিচার করা হয়েছে মানুষের সুখের মাধ্যমে যে মানুষ এই জগতে বাস করে। জাগতিক সুখকে সুনিশ্চিত করাই আমাদের নৈতিক উদ্দেশ্য। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ধর্মীয় প্রভাবে আমাদের চিন্তা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল তখন এই চিন্তাধারা অবশ্যই বৈপ্লবিক ছিল।

Scanned with OKEN Scanner

সার্বিক সুখ যেহেতু এই মতবাদের আদর্শ তাই এই মতবাদকে সার্বিক সুখবাদ বা universalistic hedonism বলা হয়। আমার কর্ম হবে 'বহুজনহিতায়' যা বিশ্বজনের পক্ষে উপযোগী। এই দিক থেকে আলোচ্য মতবাদকে উপযোগবাদ বা utitilarianism বলা হয়েছে।

ধ্রুপদী উপযোগবাদের সমর্থক ছিলেন বেন্থাম এবং মিল। তাঁদের বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিম্নলিখিত তিনটি বচনের মাধ্যমে উপস্থিত করা যেতে পারে :

(ক) কর্মের পরিণাম বিচার করেই তার ভালো-মন্দ বিচার করা উচিত। কর্মের নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে আর কিছুই বিচার্য নয়। যে কাজের পরিণাম সবচেয়ে ভাল সেই কাজকেই যথোচিত বলে গণ্য করা উচিত।

(খ) কর্মের পরিণামের মূল্যায়নে সেই কর্ম কতখানি সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করতে পেরেছে তা দেখা প্রয়োজন। পরিণামের মূল্যায়নে সুখ ছাড়া অন্য সবকিছুই অপ্রাসঙ্গিক। সেই কাজকেই যথোচিত বলে গণ্য করা হবে যে কাজ দুঃখের তুলনায় সুখই বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করে, বেদনার তুলনায় আনন্দই বেশি সৃষ্টি করে।

(গ) একটি কর্ম থেকে উৎপন্ন সুখ ও দুঃখের পরিমাণগত তারতম্য বিচারের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষের সুখকে অন্যের সুখের তুলনায় বেশি মূল্যবান বলে মনে করা চলবে না। প্রত্যেক মানুষের সুখ বা কল্যাণ সমান মূল্যবান।

এই তিনটি বচনকে একত্র সংগ্রহ করে বলা যায় যে, সেই কাজকেই যথোচিত বলে গণ্য করা হবে যে কাজ বিভিন্ন মানুষের সুখের মধ্যে মূল্য বা গুরুত্বের বৈষম্য না করে জগতে দুঃখের তুলনায় সুখই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করে।

বেন্থামের উপযোগবাদ

বেন্থামকে উপযোগবাদের প্রথম প্রবক্তা বলা হয়। তিনি উপযোগবাদকে একটি বিমূর্ত নীতিতত্ত্ব বলে মনে করেননি। ব্রিটিশ আইন ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য তিনি উপযোগবাদকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে নাগরিকদের কল্যাণসাধন করাই আইনের উদ্দেশ্য। অপরাধ ও শাস্তিবিধান প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে একজন মানুষকে কেন অপরাধী বলে মনে করা হয়? সেই ব্যক্তির কর্ম সমাজের অন্য ব্যক্তির দুঃখের কারণ হয় বলেই তাকে অপরাধী বলা হয়। অপরাধীর শাস্তি এইরকম হওয়া উচিত যাতে অপরাধ করে সে যে সুবিধা ভোগ করেছে তা রোধ করা যায়। যতটুকু শাস্তি তাকে ভবিষ্যতে আবার অপরাধ করা থেকে বিরত করে ততটুকু শাস্তিই তার প্রাপ্য। বেন্থাম আসলে এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে নাগরিকদের হিতসাধন করাই শাস্তির উদ্দেশ্য। যা হিতকর তাই উপযোগী। বেন্থামের এই মনোভাব তাঁর মূল নৈতিক সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

Scanned with OKEN Scanner

তিনি বলেছেন যে আমাদের যে কাজ সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুখ আনতে পারে সেই কাজই ভালো এবং আমাদের সেইরকম কাজই করা উচিত। যে কাজ সুখকে সর্বাধিক মাত্রায় উৎপন্ন করতে পারে এবং দুঃখকে ন্যূনতম স্তরে নিয়ে আসতে পারে সেই কাজই উপযোগী। যে কাজ এই অর্থে উপযোগী সেই কাজই ভালো।

উপযোগবাদীরা বলেন যে আমরা সেই বস্তুটি লাভ করার জন্যই কাজ করতে পারি যার স্বগত মূল্য আছে। একমাত্র সুখই সেই বস্তু। বেস্থাম (ও মিল) যেহেতু উপযোগকে সুখের মাধ্যমেই কল্পনা করেছেন তাই তাঁর নীতিদর্শনকে সুখবাদী উপযোগবাদও (hedonistic utilitarianism) বলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে জি.ই. মূর মনে করেছেন যে কোন একটি বিশেষ বস্তু বা লক্ষ্য উপযোগের অর্থ হতে পারে না। সুখ ছাড়াও বহু বিষয়ের স্বগত মূল্য আছে— যেমন, জ্ঞান, সাহস, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য প্রভৃতি। এই জাতীয় উপযোগবাদকে বহুত্ববাদী উপযোগবাদ (pluralistic utilitarianism) বলা হয়।

বেস্থাম উপযোগবাদকে যেভাবে দেখেছেন তাকে আমরা তাঁর মূল গ্রন্থ[১] অনুসরণ করে উপস্থিত করব। বেস্থাম বলেছেন—

প্রকৃতি মানুষকে দুটি সার্বভৌম প্রভুর অধীনস্থ করেছে—যাদের নাম দুঃখ ও সুখ। আমাদের কি করা উচিত এবং আমরা কি করব সে বিষয়ে একমাত্র তারাই নির্দেশ দিতে পারে। আমরা যা কিছু করি, যা কিছু বলি, যা কিছু চিন্তা করি— এই সমস্তই তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। উপযোগের নীতিতে এই অধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। যাঁরা এ কথা স্বীকার করেন না তাঁরা অর্থহীন, যুক্তিহীন কথা বলেন।

উপযোগ সম্বন্ধে বেস্থাম বলেছেন যে, একটি বস্তুর সেই ধর্মকেই উপযোগ বলা হয় যে ধর্ম মানুষকে সুখ, কল্যাণ বা শান্তি এনে দেয় অথবা যা অমঙ্গল, বেদনা বা দুঃখকে প্রতিরোধ করে। যার দ্বারা সুখ বা আনন্দ উৎপন্ন হয় সে একজন ব্যক্তি হতে পারে বা একটি বৃহত্তর সমাজ হতে পারে। বেস্থাম অবশ্য সমাজকে অলীক বলেছেন, কারণ যে সমস্ত মানুষ সমাজের সদস্য তারাই সমবেতভাবে সমাজ রচনা করে। তা হলে সমাজের সদস্যদের স্বার্থ বা উপযোগের সমন্বয়কেই সমাজের স্বার্থ বলা হবে। বেস্থাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনে যে ব্যক্তির স্বার্থকে না বুঝলে সমাজের স্বার্থকে বোঝা যায় না।

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে উপযোগবাদ মানুষের মধ্যে শুধুই স্বার্থপরতাকে দেখেনি। বেস্থাম এ কথা অস্বীকার করেননি যে মানুষের মধ্যে

নিজের স্বার্থসিদ্ধির স্পৃহা আছে। মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের এই বক্তব্যকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি। কিন্তু তিনি একই সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে নিজের স্বার্থকে অতিক্রম করে অন্যের স্বার্থ রক্ষার আগ্রহও মানুষের মধ্যে রয়েছে। তবু প্রশ্ন ওঠে যে মানুষ কেন তার স্বাভাবিক স্বার্থপর প্রবণতাকে উপেক্ষা করে অন্যের স্বার্থ ও সুখের অন্বেষণ করবে? মানুষের এই প্রবৃত্তি তো স্বাভাবিক নয়, বরং তার স্বাভাবিক আত্মমুখী প্রবৃত্তির বিরোধী। এই সংশয়ের একটি উত্তর আমরা চাইতে পারি।

বেন্থাম মনে করেন যে পরার্থপরতার সপক্ষে নৈতিক নিয়ন্ত্রণ আছে। এই নিয়ন্ত্রণের প্রভাবেই মানুষ নিজের স্বার্থের গণ্ডীকে অতিক্রম করে যায় এবং অন্যের সুখের কথা চিন্তা করে। বেন্থাম চার প্রকার নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন— (ক) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ, (খ) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, (গ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও (ঘ) ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণগুলি আছে বলেই মানুষ নিজের সুখ বিসর্জন দিয়েও অন্যের সুখের জন্য সচেষ্ট হয়।

এই নিয়ন্ত্রণগুলি কি রকম? (ক) প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী আহার-বিহারে আমাদের সংযত হওয়া উচিত। অসংযত আহার ও ভোগবিলাস আমাদের শরীরের চূড়ান্ত ক্ষতি করতে পারে। তাই জীবনে সংযম পালন করা উচিত—এই নিয়মই প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ মানুষকে অসংযত ভোগ থেকে বিরত করে।

(খ) রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে যদি কোন মানুষ কেবল নিজের স্বার্থই চরিতার্থ করতে চায় তাহলে রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিয়ে তাকে আইনের পথে ফিরিয়ে আনে। এরই নাম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

(গ) সমাজে বাস করে মানুষ যদি অসামাজিক কাজ করে তাহলে সে সমাজের দ্বারা তিরস্কৃত হয়। এই তিরস্কারের ভয়ে সে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে। এর নাম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

(ঘ) ঈশ্বরের কাছে শাস্তি পাবার আশঙ্কায় মানুষ পৃথিবীতে অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। এই ভীতি ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণরূপে কাজ করে। এই চারটি নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলেই আমরা অন্যের স্বার্থকে উপেক্ষা করে শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি করি না। মানুষ আত্মসুখ লাভের জন্য ব্যগ্র। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণগুলি থাকার জন্য সে পরসুখ কামনা করতে বাধ্য হয়।

বেন্থামের উপযোগবাদের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন সুখের মধ্যে গুণগত প্রভেদ স্বীকার করেননি, তবে তাদের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য থাকতে পারে। যে সুখের পরিমাণ বেশি সেই সুখই কাম্য। সুতরাং বেন্থাম সুখকে এবং দুঃখকে পরিমাপযোগ্য বলে মনে করেছেন। দুঃখ এবং

Scanned with OKEN Scanner

উপযোগবাদ ঃ মিল

জন স্টুয়ার্ট মিলকে উপযোগবাদী দার্শনিক বেন্থামের উত্তরসূরী বলে উল্লেখ করা হয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে এ কথা সত্য হলেও মিলের রচনার মধ্য দিয়েই উপযোগবাদ একটি পরিশীলিত তত্ত্বের রূপ লাভ করেছে। মিলের রচনায় উপযোগবাদ অনেক বেশি মনস্তত্ত্বসম্মত এবং যুক্তিনিষ্ঠ। মিল শুধুমাত্র একজন নীতিদার্শনিক নন। সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে যে আদর্শকে তিনি উপস্থিত করেছিলেন তারই ভিত্তিরূপে উপযোগবাদ পরিকল্পিত হয়েছিল।

উপযোগবাদী মিল Greatest Happiness Principle বা সর্বাধিক আনন্দের নীতিকে গ্রহণ করেছিলেন। আনন্দের ধারণা কখনো কখনো সুখের ধারণার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। তাই সর্বাধিক সুখের নীতিই যে মিলের উপযোগবাদের সারকথা এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মিল-এর মতে কর্মগুলির মধ্যে যে অনুপাতে সুখ উৎপাদন করার প্রবণতা আছে সেই অনুপাতে তারা যথোচিত এবং যে অনুপাতে তাদের মধ্যে সুখের বিপরীত অর্থাৎ দুঃখ উৎপাদন করার প্রবণতা আছে সেই অনুপাতে তারা অনুচিত।

("Actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness.")

মিল উপযোগবাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে দুটি বিষয় আমাদের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন, প্রথমতঃ মিল একটি কাজকে সেই অনুপাতে ভালো বলেছেন যে অনুপাতে কাজটি সুখ উৎপাদন করবে। তাহলে আমাদের কাজ যে সুখ উৎপাদন করবে তার পরিমাণের তারতম্য অনুযায়ী কাজটির ভালোত্বের মাত্রাও নির্ধারিত হবে। তাহলে বলতে হয় যে আমাদের কাজের ভালোত্বের মাত্রাভেদ আছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা দুটি কাজের মধ্যে তুলনা করে বলতে পারি যে একটি কাজ অন্য কাজটির তুলনায় বেশি ভালো। আমরা কিন্তু দুটি ভালো কাজের মধ্যে একটিকে বেশি ভালো এবং অপরটিকে কম ভালো বলি না। একটি

Scanned with OKEN Scanner

কাজ হয় ভালো অথবা মন্দ হবে। মিলের কথা স্বীকার করলে বলতে হবে যে কোন কাজ যাকে আমরা সাধারণত মন্দ বলে মনে করি তাও অন্য ভালো কাজের তুলনায় কম ভালো বলে গণ্য হবে। ভালো-মন্দের বৈপরীত্য এখানে আর থাকে না। তাই মনে হয় যে সুখ উৎপাদন ক্ষমতার তারতম্যের অনুপাতে কর্মের ভালোত্বকে বিচার করা সঙ্গত নয়।

অনেকের মতে মিল হয়ত একথাই বলতে চেয়েছেন যে, আমাদের যে কর্ম সুখ উৎপাদন করে একমাত্র তাই যথোচিত কর্ম।

বেন্থামের উপযোগবাদে ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক সুখের ধারণায় সমালোচকরা স্থূলতা লক্ষ্য করেছিলেন। মিল-এর উপযোগবাদ এই স্থূলতা থেকে মুক্ত এবং মার্জিত বা পরিশীলিত। বিভিন্ন সুখের মধ্যে পরিমাণগত তারতম্যের ধারণাকে উপেক্ষা করে মিল বিভিন্ন সুখের গুণগত উৎকর্ষতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর ফলে মিল-এর দৃষ্টিতে মানুষের ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক পরিচয় বড় হয়ে উঠতে পারেনি। মিল মানুষকে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সর্বস্ব প্রাণীর তুলনায় স্বতন্ত্র এবং উন্নত বলে মনে করেছেন। মানুষ সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই মিল-এর উপযোগবাদ পরিশীলিত রূপ লাভ করেছে।

মিল উপযোগবাদের দুটি ভিত্তির উল্লেখ করেছেন—

(১) উপযোগবাদের নীতির একটি আদর্শমূলক ভিত্তি এবং

(২) মানব প্রকৃতি সম্পর্কে একটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি।

প্রথমতঃ উপযোগবাদ সর্বাধিক আনন্দের নীতিকে উপযোগের নীতি বলে মনে করে; এবং এই নীতিটি নৈতিকতার মূল ভিত্তি। মিল সেই কর্মকেই সঠিক বা যথোচিত বলে স্বীকার করেছেন যার মধ্যে আনন্দ উৎপন্ন করার প্রবণতা আছে। এর বিপরীতধর্মী কাজ অনুচিত। এই মত অনুসারে সুখলাভ ও দুঃখ থেকে মুক্তি এই দুটিই আমাদের কাম্য। সুখ বা আনন্দ অর্জন করা এবং দুঃখকে প্রতিরোধ করাই আমাদের জীবন ও কর্মের আদর্শ।

মিল তাঁর উপযোগবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অন্য মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধ করার একটি প্রবণতা আছে। বেন্থাম বলতে চেয়েছিলেন যে আমরা যেন নিজেদের স্বার্থেই অন্যের স্বার্থ রক্ষা করি। মিল কিন্তু মানুষের পরার্থপরতাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেননি; বরং তিনি মানুষের সামাজিকতাবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। চোখের সামনে হত্যা অনুষ্ঠিত হতে দেখে আমরা যেমন শিহরিত হই সেইরকম অন্যের স্বার্থ বা প্রয়োজন দেখেও আমরা সংবেদনশীল হয়ে পড়ি। মিল মনে করেছেন যে আমাদের মধ্যে অন্যের

Scanned with OKEN Scanner

প্রতি সামান্য হলেও একটি স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে। নৈতিকতা এই সহানুভূতিকে জাগ্রত করে। উপযোগের নীতি তার সহায়তা করে।

মিল তাঁর উপযোগবাদের মূল তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছিলেন 'Utilitarianism' নামক গ্রন্থে। সেখানে একদিকে তিনি সুখবাদী আদর্শের মাধ্যমে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করেছেন, অপরদিকে পরসুখবাদ যে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ কথার উল্লেখ করেছেন।

মিল নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই সুখবাদী দর্শন হয়ত অনেকের দৃষ্টিতেই রুচিকর বলে মনে হবে না। যে জীবন সুখ ছাড়া অন্য কোন মহৎ বস্তুকে কামনা করে না সেই জীবন যথার্থ মানুষের জীবন হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মিলের অভিমতের তীক্ষ্ণতাকে বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে তিনি কেবল সুখের সন্ধানী মানুষকে নগণ্য শূকরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক সুখবাদ মানুষকে অন্য প্রাণীর তুলনায় মহৎ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে না।

আসলে মিল গভীরভাবে বিশ্বাস করেছেন যে মানুষের জীবন শূকরের জীবনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। সাধারণ প্রাণীদের জৈব প্রবৃত্তির তুলনায় মানুষের মধ্যে অনেক উন্নত বৃত্তি আছে। এই বৃত্তির পরিতৃপ্তি তাকে যথার্থ আনন্দ দেয়।

উপযোগবাদ মানসিক সুখকে দৈহিক সুখের তুলনায় শ্রেয় বলে মনে করেছিল। কিন্তু তার কারণ এই ছিল যে মানসিক সুখ দৈহিক সুখের তুলনায় অনেক বেশি স্থায়ী এবং সুরক্ষিত। উপযোগবাদ এইভাবে মানসিক ও দৈহিক সুখের মধ্যে তুলনা করেছিল। কিন্তু মানুষের স্বভাবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানসিক সুখ যে স্বরূপতঃ অর্থাৎ গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ এ কথা মিলের পূর্বে কোন উপযোগবাদী উপলব্ধি করেননি। মিল অভিযোগ করেছেন যে, সমস্ত বিষয়ে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুণ এবং পরিমাণকে সমানভাবে বিবেচনা করা হয়। সুখের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধু পরিমাণকেই বিবেচনা করার কোন হেতু নেই।

মিলের উপরোক্ত বক্তব্য যে বেন্থামের উপযোগবাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হয়েছিল তা অত্যন্ত স্পষ্ট যদিও তিনি এই মতবাদের প্রথম প্রবক্তার নাম উল্লেখ করেননি। মিল বিশ্বাস করেন যে দুটি সুখের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, দুটি সুখের মধ্যে সমস্ত মানুষ বা অধিকাংশ মানুষ যেটিকে পছন্দ করে সেই সুখই অধিকতর কাম্য। আমরা একটি সুখকে অপরটির তুলনায় এতই কাম্য বলে মনে করি যে সেই সুখের প্রাপ্তির মধ্যে অসন্তোষ থাকলেও আমরা তাকে পরিত্যাগ করি না। তাহলে সেই সুখের অনুভূতিকে গুণগতভাবে উৎকৃষ্ট বলে মনে করতে হবে।

Scanned with OKEN Scanner

শাস্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

Different Theories of Punishment

মানুষ যখন আইন ভঙ্গ করে তখন সে শাস্তিভোগ করে। শাস্তির ফলে অপরাধী হয়ত তার সম্পত্তি বা অর্থ বা কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে নিয়ম ভঙ্গ করলে জরিমানা হয়। আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ভঙ্গ করলে কারাদণ্ড হতে পারে। চরম অপরাধ অর্থাৎ হত্যার শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ড হতে পারে। সমাজ বা রাষ্ট্র এইভাবে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী অপরাধীর অর্থ বা স্বাধীনতা অথবা জীবন নিতে পারে। রাষ্ট্র যে এইভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে তা অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্র যে তার নাগরিকদের উপর এইরকম ক্ষতি দণ্ডস্বরূপ আরোপ করে তার সপক্ষে রাষ্ট্র কি যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে? শাস্তিদানের যৌক্তিকতাকে কিভাবে প্রতিপাদন করা যায়?

এই প্রশ্নের দু'রকম উত্তর দেওয়া যায়—একটি প্রতিশোধমূলক (retributive) এবং অপরটি উপযোগিতামূলক (utilitarian)। প্রথম মতবাদে শাস্তিকে প্রতিশোধ বলে মনে করা হয়। শাস্তি যেন অপরাধীর দুষ্কর্মকে তারই কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। প্রতিশোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন অপরাধী সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করেছে—এই অপরাধই তাকে শাস্তি দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি।

উপযোগবাদীরা বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখেন। উপযোগবাদীর মতে যে কর্ম কল্যাণকর নয় নীতিগতভাবে সেই কর্মকে ভালো বলা যায় না। শাস্তি যেহেতু

Scanned with OKEN Scanner

মানুষের ক্ষতিসাধন করে তাই শাস্তির যদি কোন কল্যাণকর দিক না থাকে তাহলে শাস্তিকে সমর্থন করা যাবে না। শাস্তিকে তখনই সমর্থন করা যাবে যদি তার পরিণামে কারও কোন কল্যাণ হয়। উপযোগবাদীরা মনে করেন যে শাস্তি অবশ্যই উপযোগী বা মঙ্গলজনক। চুরির জন্য শাস্তি দেওয়া হয় বলে খুব কম লোকই চুরি করে। হত্যার জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় বলে কম মানুষই খুন করে। সুতরাং শাস্তির সমর্থনে এ কথা বলা যায় যে শাস্তির উপযোগিতা আছে। শাস্তি মানুষকে অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত করে।

শাস্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কে যে মতবাদটি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত সেই মতবাদে অপরাধীর পুনর্বাসনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পুনর্বাসন তত্ত্ব অপরাধের জন্য ব্যক্তিকে দায়ী করে না। সামাজিক পরিবেশ মানুষকে অপরাধী করে তোলে। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তার সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যাতে তাকে সংশোধন করে সমাজে তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়।

প্রতিরোধাত্মক মতবাদ
Preventive or Deterrent Theory

এই মতবাদ অনুসারে সমাজে অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যেই শাস্তি দেওয়া হয়। একজন ব্যক্তি যে অপরাধ করেছে তাকে দমন করার প্রশ্ন ওঠে না। তবে ভবিষ্যতে যাতে একই রকম অপরাধ আর না ঘটে সেইজন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে সমাজকে শিক্ষাদান করাই শাস্তির উদ্দেশ্য। এই শিক্ষার জন্য একজন অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে সমাজের সামনে একটি দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই রকম অপরাধকে প্রতিরোধ করা যেহেতু শাস্তির উদ্দেশ্য তাই এই মতবাদকে প্রতিরোধাত্মক মতবাদ বলা হয়। স্বভাবতঃই এই মতবাদ কঠোর শাস্তিকে অনুমোদন করে, কারণ কঠোর শাস্তি সমাজের অন্যান্য মানুষের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হতে পারে। শাস্তির নির্মম কঠোরতা মানুষকে অনুরূপ অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে। শাস্তি তখনই সার্থক যখন তা অন্য মানুষকে অনুরূপ অপরাধ করার প্রবণতা থেকে নিবৃত্ত করে। অপরাধী এখানে শুধুই একটি দৃষ্টান্ত অথবা সমাজশিক্ষার হাতিয়ার।

এই মতবাদ অবশ্যই এ কথা মনে করে যে মানুষ ভীতির প্রভাবেই অনৈতিক পথে যায় না। এখানে ভীতিকেই মানুষের নৈতিক জীবনের ভিত্তি বলে মনে করা হয়েছে। কঠোর শাস্তির নির্মম দৃষ্টান্ত মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। এই ভীতিই মানুষকে একই রকম অপরাধমূলক কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে।

Scanned with OKEN Scanner

সংশোধনাত্মক মতবাদ
Reformative Theory

এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে অপরাধীকে সংশোধন করাই শাস্তিদানের উদ্দেশ্য। শাস্তি যেন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে। মানুষ কেন অপরাধ করে? —এই প্রশ্নের একটি অভিনব উত্তর এই মতবাদের সমর্থকদের কাছে পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা সুপ্ত থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে মানুষ নৈতিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। এই পতনের জন্য সে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নয়। তাই তার মধ্যে যে শুদ্ধতা বা নৈতিকতা সুপ্ত রয়েছে তাকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। শাস্তি মানুষের সুপ্ত নৈতিকতাকে প্রকট করে তার অধঃপতিত সত্তাকে নৈতিক আসনে প্রতিষ্ঠা করে।

সুতরাং সংশোধনাত্মক মতবাদের বিশ্বাসের তিনটি দিক আছে—(ক) মানুষের অপরাধের জন্য সামাজিক পরিবেশই দায়ী; (খ) এই সামাজিক পরিবেশ তার শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকর প্রবণতাকে আচ্ছন্ন করে; (গ) শাস্তি এই আবরণকে দূর করে তার স্বাভাবিক অথচ সুপ্ত নৈতিকতাবোধকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে।

এই মতবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে শাস্তির উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনে সাহায্য করা। দৈহিক পীড়নের ফলে অপরাধীর পুনর্বাসন হয় না। শাস্তি যখন দৈহিক অত্যাচারে সীমাবদ্ধ থাকে না তখন তার একটি অন্য চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। শাস্তিদাতা তখন শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষা যখন যথার্থ হয় তখন অপরাধী যেন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। তার অপরাধী সত্তা দগ্ধ হয়ে তার জায়গায় এক শুদ্ধ সত্তার প্রতিষ্ঠা হয়। তখন অপরাধী নিজেই স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করে।

সমসাময়িক শিক্ষাব্রতীদের কাছে সংশোধনাত্মক শাস্তিতত্ত্ব বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তার কারণ এই মতবাদ আধুনিক যুগের মানবিকতাবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মনোবিশ্লেষণী মনোবিদ্যাও এই মতবাদের মূল কথার সঙ্গে একমত। মনোবৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেছেন যে কোন মানুষই অপরাধ করতে চায় না। তার মধ্যে এমন কোন প্রবৃত্তি রয়েছে যাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং সেই প্রবৃত্তিই তার এই অস্বাভাবিক আচরণের কারণ। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে এই অস্বাভাবিকতাকে দূর করতে হবে। শাস্তি এই শিক্ষার বাহন।

Scanned with OKEN Scanner

কোন কোন [illegible]

প্রতিশোধাত্মক মতবাদ

Retributive Theory

এই মতবাদকে সর্বাধিক প্রাচীন বলে মনে করা হয়। 'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত'—এই নীতির মধ্যে প্রতিশোধের প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে। অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ এই মতে শাস্তির মূল কথা। তবে এই মতের মধ্যে শুধুই মানুষের একটি প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে একথা মনে করলে এই শাস্তিতত্ত্বের পিছনে আরও যে নানা বিশ্বাস কাজ করছে তা মিথ্যা হয়ে যাবে।

এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে মানুষ তার ঐচ্ছিক ক্রিয়ার জন্য দায়ী। অতএব মানুষকে তার যে কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। সুতরাং কোন মানুষ যদি অপরাধ করে তাহলে সেই অপরাধের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

যাঁরা এই মতের সমর্থক তাঁরা মনে করেন অপরাধের দায়িত্ব বহন করাই শেষ কথা নয়। একজন অপরাধী তার অপরাধের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে বা সমাজের

Scanned with OKEN Scanner

যতখানি ক্ষতিসাধন করে ঠিক ততখানি ক্ষতি তাকে স্বীকার করতে হবে। 'চোখের বদলে চোখ'—এই নীতিতে অপরাধ এবং শাস্তির মধ্যে যেন গাণিতিক সমানুপাতের আভাস আছে। শাস্তিদানের ক্ষেত্রে এইরকম সমানুপাত নির্ণয় করা সম্ভব কিনা সন্দেহ, কিন্তু এই মতবাদ শাস্তিদাতাকে এই বিষয়ে সজাগ করে।

প্রতিশোধাত্মক মতবাদ মনে করে যে আমরা অপরাধীর উপর শাস্তি আরোপ করি না। অপরাধই যেন শাস্তিকে ডেকে নিয়ে আসে। এখানে আমাদের ভূমিকা গৌণ। শাস্তিকে তাই অনেকে অপরাধীর অধিকার (right) বলেছেন। যে অধিকার তার প্রাপ্য তা তাকে প্রদান করাই উচিত। যে সমাজ অপরাধীকে শাস্তি দেয় সেই সমাজ অপরাধীর অর্জিত দাবি পূরণ করে।

অপরাধীই অপরাধের জন্য দায়ী একথা সত্য হলেও অনেকে বলেছেন যে অপরাধী তার অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নয়। মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা থাকতে পারে। কিন্তু সেই সুপ্ত প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে পরিবেশের প্রভাবে। একথা যদি স্বীকার করি তাহলে অপরাধীকে অপরাধের সমপরিণাম শাস্তি দেওয়া অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে। অপরাধের দায়িত্ব অপরাধী ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেলে শাস্তির পরিমাণও সেই অনুপাতে কমে যাবে।

প্রতিশোধাত্মক মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা একথা স্বীকার করেন। এইভাবে সংশোধনাত্মক মতবাদের একটি নতুন আকার পাওয়া যাবে। যাঁরা মানুষকে তার অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বলে মনে করেন এবং পরিবেশের কোন ভূমিকা স্বীকার করেন না তাঁরা প্রতিশোধাত্মক মতবাদকে অতি কঠোর তত্ত্ব হিসাবে উপস্থিত করেন। কিন্তু অন্য একটি মত অনুসারে অপরাধের বিচারের সময় অপরাধীর পরিবেশ ও পরিস্থিতি যেমন বিচার করা প্রয়োজন সেইরকম অপরাধীর মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিও বিবেচনা করা আবশ্যক। এই সমস্ত পশ্চাদ্‌পট বিবেচনা করে শাস্তির মাত্রা নির্ণয় করা উচিত। প্রতিশোধাত্মক মতবাদের এই নমনীয় আকারকে 'লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদ' (mollifed form of retributive theory) বলা হয়।

Scanned with OKEN Scanner

৪.১. 'মানুষের অধিকারের' বৈষম্য (Discrimination of Human Rights)

'মানুষের অধিকার' বলতে যদি বোঝায় 'কয়েকটি বিষয়ে সব মানুষের সমান অধিকার' তাহলে এটা মানতে হয় যে, মানবসমাজে ঐ অধিকারের প্রতিষ্ঠা আজও সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ-আফ্রিকায় এবং আমেরিকায় জাতি-বৈষম্যের জন্য কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের ক্ষেত্রে 'মানুষের অধিকার' প্রতিষ্ঠা পায়নি। ভারতবর্ষে বর্ণ-বৈষম্যের জন্য তফশিলী সম্প্রদায়ের মানুষের ক্ষেত্রে 'মানুষের অধিকার' প্রতিষ্ঠা পায়নি। সব মানবসমাজেই লিঙ্গ-বৈষম্যের জন্য স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে 'মানুষের অধিকার' প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, এবং নিজ ধর্মের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসের জন্য অনেক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 'মানুষের অধিকার' প্রতিষ্ঠা পায়নি। 'মানুষের অধিকার' থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রগুলি পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

৪.২. জাতি-বৈষম্য (Racism or Discrimination on the basis of Race)

৪.২.১. জাতিগত বৈষম্যের স্বরূপ (Nature of the discrimination on the basis of Race or Racism)

'কোন কর্ম, রীতিনীতি অথবা মনোভাবকে 'জাতি-বৈষম্যমূলক' (racial) বলা হবে যদি ঐ সব যুক্তিহীনভাবে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির বিভেদ সৃষ্টি করে এবং অসঙ্গতভাবে ঐ পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে একজাতি অন্য জাতির ক্ষতিসাধন করে, তাকে শোষণ করে।'[১] তাহলে 'জাতি-বৈষম্যবাদী (racist) বলতে তাদের বোঝানো হয় যারা যুক্তিহীনভাবে মনে করে যে, জাতির সঙ্গে জাতির যে পার্থক্য তা কৃষ্টিগত মৌলিক পার্থক্য, কেননা তা নির্ধারিত হয় জন্মসূত্রের দ্বারা। জাতি-বৈষম্যবাদীরা তাই বিশ্বাস করেন যে, জন্মগত উপাদান অনুসারে জাতি উৎকৃষ্ট হতে পারে, আবার অপকৃষ্ট হতে পারে এবং অপকৃষ্ট জাতিকে শোষণ করা বা নিগৃহীত করার অধিকার উৎকৃষ্ট জাতির ন্যায্য অধিকার।

Scanned with OKEN Scanner

জাতি-বৈষম্য বলতে সাধারণত দক্ষিণ-আফ্রিকা ও আমেরিকার সাদা ও কালোর আমেরিকান ও নিগ্রোদের মধ্যে বৈষম্যকে বোঝানো হয় ; কিন্তু জাতি-বৈষম্যের পরিধি ব্যাপক। আমেরিকার অধিবাসীদের সঙ্গে এশিয়াবাসী অথবা আমেরিকার আদিম অধিবা যে বৈষম্য করা হয় তাও জাতি-বৈষম্য। জাপানীরা শ্বেতকায় মানুষের সঙ্গে নিজেদের ভিন্ন করে তা জাতি-বৈষম্য। আফ্রিকার নিগ্রোদের সঙ্গে সেখানকার আদিবাসীদের যে তাও একরকম জাতি-বৈষম্য। **জাতি-বৈষম্যমূলক মনোভাব যেখানে এবং যেভাবেই পাক না কেন তা সর্বদাই নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা তা মানব-অধিক পরিপন্থী এবং তা সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক।** দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কৃষ্ণকায় নিগ্রোকে যদি 'নিগ্রো হবার অজুহাতে' শ্বেতকায়দের বিদ্যায়তনে দর্শনের শিক্ষ পদে নিয়োগ করা না হয় তাহলে তা হবে সম্পূর্ণভাবে যুক্তিহীন ও নীতিহীন কাজ যা স ও ব্যক্তিজীবনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, কেননা তার ফলে শ্বেতকায় ছাত্রছাত্রীরা ঐ সু শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে এবং কৃষ্ণকায়দের মধ্যে **'মানু অধিকারে'** বাধা সৃষ্টির জন্য অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হবে।

জাতি-বৈষম্য মূলত দুই ধরনের হতে পারে—**প্রকট বা প্রকাশ্য** (overt racism), **অ বা অপ্রকাশ্য** (covert racism)। **প্রকট জাতিবাদের ক্ষেত্রে** জাতি-বৈষম্যমূলক মনোভা আচরণ অকপটে প্রকাশ করা হয়। কিছুদিন আগেও দক্ষিণ-আফ্রিকায় জাতি-বৈষম্যের ধর ছিল প্রকট ; শ্বেতকায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যায়তনে কৃষ্ণকায় ছাত্রছাত্রীদের প্র নিষিদ্ধ ছিল এবং ঐ নিষেধটি ছিল আইনসম্মত। **অপ্রকট জাতিবাদের** ক্ষেত্রে জা বৈষম্যমূলক মনোভাব ও আচরণ সরাসরি প্রকাশ পায় না, তা প্রকাশ করা হয় পরোক্ষভ কোন কৌশলের মাধ্যমে। যেখানে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় ছাত্রছাত্রীদের স্বতন্ত্রভাবে পঠন-পা নিষিদ্ধ নয় অর্থাৎ গাত্রবর্ণ অনুসারে বিদ্যায়তনের বিভাগ আইনসম্মত নয়, সেখা অঞ্চলভিত্তিকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে তার মাধ্যমে শ্বেতকায়গণ তাদের ঐ উদ্দেশ্যসা করে। এখানে অঞ্চলভিত্তিক বসবাসের ব্যবস্থাটি হল— শ্বেতকায়রা যে জেলায় বসবাস কর কৃষ্ণকায়রা সেখানে বসবাসের অনুমতি পাবে না, তারা ভিন্ন জেলায় বসবাস করবে। এ ব্যবস্থায় স্বভাবতই শ্বেতকায় অধ্যুষিত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে কেবল তাদের সন্তানসন্তি পঠন-পাঠনের সুযোগ পায় ; অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য হওয়ার জন্য দূরবর্তী অঞ্চলে কৃষ্ণকায় ছাত্রছাত্রী ঐসব বিদ্যায়তনে পাঠ নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এখানে, কৌশ অঞ্চলভিত্তিক বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে শ্বেতকায়গণ তাদের জাতি-বৈষম্যমূলক মনোভাব প্রক করে।

জাতি-বৈষম্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এযাবৎ জাতি বৈষম্যমূলক মনোভাব, কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের সম্পর্কে শ্বেতকায় মানুষদের মনোভাব, অত্যন্ত প্রব ছিল। জাতি-বৈষম্য প্রসঙ্গে এপ্রকার মনোভাবকে বলা চলে **প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীল** (con servative) **মনোভাব**। এই প্রকার মনোভাবের মূলে হল, দাস-প্রথা—ইউরোপ এব আমেরিকার দেশগুলিতে দীর্ঘদিন শ্বেতকায়গণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের দাসরূপে ব্যবহা করেছে, 'মানুষের অধিকার' থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। তবে, বর্তমানে একদল

iberal) আবির্ভাবের ফলে মানুষের মধ্যে নব-চেতনার উন্মেষ হয়েছে। জন-মানসের এপ্রকার ব জাগরণের ফলে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে জাতিগত-বৈষম্যমূলক মনোভাব এখন আর তমন উগ্র নেই।

৪.২.২. রক্ষণশীল মতবাদ (Racial conservatism or Extreme form of Racism)

উগ্র জাতিবৈষম্যপন্থীরা তাঁদের বৈষম্যমূলক মনোভাবের সমর্থনে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় নুষের মধ্যে **জন্মগতির পার্থক্যের উল্লেখ করেন**। অনেকে আবার 'নিগ্রোর' সংজ্ঞায় **'নিগ্রো-ক্তের' উল্লেখ করেন**[১] অর্থাৎ এদের মতে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের রক্তের উপাদান শ্বেতকায়দের ক্তের উপাদান থেকে ভিন্ন। অনেকে আবার **জন্মগত সামর্থ্যের উল্লেখ** করে শ্বেতকায় ও ষ্ণকায়দের দুটি ভিন্নজাতিরূপে গণ্য করেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের মার্কিন ধ্যাপক আর্থার জেন্‌সেন্‌ (Arthur Jensen) এবং মনোবিজ্ঞানের ইংরেজ অধ্যাপক আইসেঙ্ক H. J. Eysenck) বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখান যে শ্বেতকায় মার্কিন ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ) ষ্ণকায় নিগ্রো ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধ্যঙ্ক অপেক্ষা গড়পড়তায় বেশি। এই সমীক্ষার ওপর নির্ভর করে ারা বলেন যে, এই পার্থক্যের মূলে হল ঐ দুই জাতের ছাত্রছাত্রীদের জন্মগতির পার্থক্য। জেন্‌সেন্‌ ার সমীক্ষার সিদ্ধান্তে বলেন 'সাদা এবং কালোর মধ্যে এই বুদ্ধিগত পার্থক্য তাদের জন্মগত পাদানের পার্থক্যকে সূচিত করে।'[২]

জাতি-বৈষম্যের উগ্র সমর্থকগণ তাই 'মানুষের অধিকার'কে মূল্যবানরূপে গণ্য করলেও, নব মানুষের সমান অধিকার' একথা স্বীকার করলেও, কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের অধিকারকে মর্যাদা ন না এবং হেতু স্বরূপ তাঁরা কেবল একথাই বলেন, 'কেননা তারা নিগ্রো।' অর্থাৎ 'এখানে জাতি-বৈষম্যের একমাত্র হেতু হল গাত্র-বর্ণ-বৈষম্য।'[৩]

দক্ষিণ-আফ্রিকার সাম্প্রতিককালের জাতি-বৈষম্যের (শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের উল্লেখ করে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। **দৈহিক যন্ত্রণামুক্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিজ রিকল্পনা অনুসারে আত্মবিকাশ** যদি মানুষের ন্যূনতম অধিকার হয়, তাহলে এটা অসঙ্কো লা যায় যে কিছুদিন পূর্বেও দক্ষিণ-আফ্রিকায় নিগ্রোদের ঐ অধিকার থেকে বঞ্চিত ক য়েছে। সঙ্গত কারণ ছাড়াই ক্ষমতাশীল শ্বেতকায় মানুষ কৃষ্ণকায়দের দৈহিক নিপীড়ন করেছে নিগ্রো শিশু উপযুক্ত শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কৃতি নিগ্রো ছাত্র অথবা ছাত্রীকে, ত অভিলাষ অনুসারে, আইন-কলেজে অথবা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার অনুমতি দেও য়নি। কেবল নিগ্রো হবার জন্য কোন ব্যক্তিকে, তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, দায়িত্ব প্রশাসনিক কোন কর্মে অথবা সম্মানজনক শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হয়নি। 'গৃহনির্মাণ

Scanned with OKEN Scanner

পরিদর্শনের অধিকর্তারূপে যেখানে সাধারণত শ্বেতকায় মানুষকেই নিয়োগ করা হয় সেখানে যদি কখনো কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, 'উর্ধ্বতন ব্যক্তি কৃষ্ণকায়'— কেবল এই অজুহাতে অধস্তন শ্বেতকায় ব্যক্তিরা কাজে অবহেলা করে।'[১] অবশ্য একথা ঠিক যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায় মানুষদের সরকারের আনুকূল্যে নিগ্রোরা তাদের ক্ষুধার অন্ন লাভ করেছে, বসবাসের জন্য আশ্রয় পেয়েছে, অসুস্থ হলে সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসালাভের সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এসব 'পাওয়ার' মাধ্যমে নিগ্রোদের 'মানুষের অধিকার' প্রতিষ্ঠা পায়নি। এসব 'পাওয়া' আনুকূল্যবশত, করুণাজনিত অর্থাৎ এসব 'পাওয়া' শর্তাধীন। **'মানুষের অধিকারের' বিষয়বস্তু নিঃশর্ত, কেননা তাতে সব মানুষের সমান অধিকার।** দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায় মানুষের উগ্র জাতি-বৈষম্যমূলক মনোভাবের নজিরস্বরূপ অধ্যাপক রিচার্ড ওয়াশেরস্ট্রম (Richard Wasserstrom) সেখানকার একটি শহরের উচ্চ-বিদ্যালয়ের বাদ্য-অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে একটি সংবাদ-টুকরোর উল্লেখ করেছেন। সংবাদপত্রের সংবাদটি হল— 'অনুষ্ঠানটি ছিল এমনই এক বাদ্যসংগীত অনুষ্ঠান যেখানে শহরের **সব** উচ্চ-বিদ্যালয়ের সব **ছাত্রছাত্রীরা** অংশগ্রহণ করেছে।' বাস্তবিকপক্ষে অনুষ্ঠানটি ছিল শ্বেতকায়দের, যেখানে নিগ্রোদের উপস্থিতি ছিল নিষিদ্ধ। সংবাদটির মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রকাশ পেয়েছে যে, ঐ শহরের শ্বেতকায়দের কাছে নিগ্রোদের জন্য নির্ধারিত উচ্চ-বিদ্যালয়ের নিগ্রো ছাত্রছাত্রীরা মানুষ নয়, তারা 'সব ছাত্রছাত্রীর' অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাদের মানুষের ন্যূনতম অধিকার থাকতে পারে না।

উগ্রপন্থী (রক্ষণশীলদের) মতবাদের সার কথা হল, কৃষ্ণকায়দের জন্মগত উপাদানের জন্যই তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম এবং সেজন্য তাঁরা উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শ্বেতকায় মানুষের সমতুল হতে পারে না, তাদের অধিকারও শ্বেতকায়দের অনুরূপ হতে পারে না।

Scanned with OKEN Scanner